TOAEP Torkel Opsahl Academic EPublisher

POLICY BRIEF SERIES

আন্তর্জাতিক অপরাধ সমুহ বিচারে পুরোন সাক্ষ্যের ব্যাবহার

মর্টেন বার্গসমো

এফ.আই.সি.এইচ.এল পলিসি ব্রিফ নং- ৬ (২০১১)

যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের পর কতদিনের মধ্যে তার বিচার হতে হবে সে বিষয়টি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইনে কোন স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অপরাধ সংঘটনের এমনকি কয়েক দশক পরও ঐসব অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আদৌ কর্তৃত্ব শূন্য হবে না। এই কারণে এবং ঐসব অপরাধ সংঘটনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট দায়বদ্ধতার ধারণাটি আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হিসেবে ক্রমবর্ধমান ভাবে স্বীকৃত হওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে মানবাধিকারের গুরুতর লংঘন, ষাটের দশকে ইন্দোনেশিয়ায় , ১৯৭১ এ বাংলাদেশে , সত্তরের দশকে ক্যাম্বোডিয়ায় এবং আশির দশকে ইরাকে সংঘটিত ঐসব গুরুতর অপরাধের তদন্ত চলছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধের বিচারও শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সন্দিগ্ধ অপরাধী এখন বয়োবৃদ্ধ, এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যরাও অনেকে ক্রমে বয়োবৃদ্ধ হয়ে চলেছেন। যদিও ঐসব অপরাধের পরিনতির কারণে সৃষ্ট দৃশ্যমান ও বিরাজিত ক্ষতর প্রতি এক গভীর সামজিক নির্লিপ্ততা / আপোষকামীতা প্রকারান্তরে সমাজকেই বৃদ্ধাংগুলি দেখাচ্ছে , এবং এ কারণে ঐসব অপরাধ সংঘটনের পরিনতিতে সৃষ্ট ক্ষত সম্পর্কে নবীন প্রজন্মের রয়েছে সীমিত ধারনা । অনেক ক্ষেত্রেই ঐসব অপরাধের বিচার বিষয়ে রাজনৈতিক সমর্থন ও নৈতিক সদিচ্ছাও ভংগুর।

'ফোরাম ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল এন্ড হিউম্যানিটারিয়ান ল', 'ইউ.সি বার্কলি ওয়ার ক্রাইমস স্টাডিজ সেন্টার' এবং আমীর এন্ড আমীর এসোসিয়েটস এর যৌথ উদ্যোগে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ঢাকায় আয়োজিত "ওল্ড এভিডেন্স এন্ড কোর ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস" শীর্ষক একদিন ব্যাপী এক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রেজেন্টেশন সমুহের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সংকলিত এই 'পলিসি ব্রিফ' বা 'নীতি সংক্ষেপ'। কয়েক দশক আগে ঘটে যাওয়া বর্ণিত অপরাধ সমুহের বিচারের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত চ্যালেঞ্জ সমুহ এই সেমিনারের আলোচ্য ছিলনা। বরং আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃত মূখ্য অপরাধ সমুহের বিচারে 'পুরোন সাক্ষ্যে'র অস্তিত্ব ও তা ব্যাবহারের ক্ষেত্রে জড়িত টেকনিক্যাল ও প্রাসংগিক দিক সমুহই ছিল এই সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য।

কয়েক দশক আগে ঘটে যাওয়া ঐসব অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলার সাক্ষিরা এখন স্বভাবতই বয়োবৃদ্ধ। তাদের স্মৃতি শক্তিও নানা যৌক্তিক কারণে এখন ক্ষতিগ্রস্থ। যে অপরাধের শিকার তারা হয়েছিল অনেকবারই তারা হয়ত তা সাক্ষাৎকার আকারে বলেছে যা সবাই জেনেছে। অনেকে হয়ত অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষি ও ভিকটিমের সাথে ব্যাপকভাবে কথাও বলেছে। সাক্ষ্য ও দলিলাদিরও হাত বদল হয়েছে অনেক সময়। এ কারনে ঐসব সাক্ষ্য ও দলিলাদির ধারাবাহিক সংরক্ষণ ও হেফাজতকরণের বিষয়টি হয়েছে অস্পষ্ট। অনেক সময় আর্কাইভ সমুহ ভেংগে ফেলা বা ধ্বংস করা বা অস্পষ্টতায় পরিনত করা হয়েছে। গণকবর ও অপরাধ সংঘটনস্থলগুলোর প্রতিও নির্বিচার হস্তক্ষেপ হয়ে থাকতে পারে । কোন প্রেক্ষাপটে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে যার বা যাদের প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও ধারণা ছিল তারা অনেকে হয়ত ইতোমধ্যে মৃত্যু বরণ করে থাকতে পারেন। আবার দীর্ঘদিন পরে ক্ষত ও বেদনাবৃত অতীতকে পুনরায় অনাবৃত না করার ইচ্ছার কারণে গুরুত্বপূর্ণ অনেক সাক্ষি তাদের জীবদ্দশায় এসব অপরাধের বিচার কার্যক্রমে সহায়তা করতে কদাচিৎ তেমনভাবে এগিয়ে আসেন ।

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ) ব্যাখ্যা করেন যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে যারা কথিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অপরাধ সংঘটন করেছিল সেইসব সন্দিগ্ধ অপরাধীর বিচার কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন ১৯৭৩ এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায় অগ্রসর হচ্ছে। বিচার কার্যক্রমের প্রত্যাশিত মান ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৯৭৩ সালের আইনে আনীত কিছু সংশোধনী উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকারের স্বীকৃত মান অনুসারে বিচার কার্যক্রম নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ট্রাইব্যুনাল তার বিচারিক কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং ন্যায় বিচার ও আইনের যথাযথ পদ্ধতি নিশ্চিত করবেন --এই বিষয়ে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিধান রাখা হয়েছে। একই সাথে ট্রাইব্যুনালে সামরিক ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির বিধান বিলোপ করা হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ঢাকায় 'ফোরাম ফর

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল এন্ড হিউম্যানিটারিয়ান ল' আয়োজিত "ওল্ড এভিডেন্স এন্ড কোর ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস" শীর্ষক সেমিনারকে এবং এ উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মারক বইকে তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশে যাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদেরকে সহায়তা প্রদানের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেন ।

অধ্যাপক ডেভিড কোহেন (ইউসি বার্কলি) আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারে 'পুরোন সাক্ষ্য' ব্যবহারে প্রাসংগিক সমস্যাবলী নিয়ে কাজ করেছেন । এসব সমস্যার অনেকগুলোই সাধারণ সাক্ষ্যগত বিষয় সংশ্লিষ্ট । এমনকি দীর্ঘ সময় পরও এক পর্যায়ে এসব সমস্যা কিভাবে হ্রাস বা বিনষ্ট করা যায় মূলত: সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন । এ প্রসংগে প্রথমত তিনি যা বলেন তা হলো , দীর্ঘ সময় পরে সাক্ষি কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণে সমস্যা । জার্মান সরকার ১৯৫৮ সাল থেকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে যাদের বিচার শুরু করেছিল তারা 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' ও 'কিলিং সেন্টারের' কর্মকর্তা ছিল এবং এ কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণে সৃষ্ট সমস্যা ক্রমেই প্রসিকিউশনকে বাধার মুখে ফেলে । আবার সাম্প্রতিক সময়ের বিচারগুলোর অনেক ক্ষেত্রে এক সময় দেখা যায় যে, কোন সাক্ষি আদৌ জীবিত নেই যা আরেকটি সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট আরেকটি অন্যতম সমস্যার সৃষ্টি করে । 'ডেমজানজুক' কেসটির কার্যক্রম কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন কোর্টে চলে এবং এই কেসে এইসব সমস্যার অনেকগুলোই ব্যাখ্যায়িত হয়েছে ।

'ট্রমা' এবং দীর্ঘ সময় হারিয়ে যাওয়ার সমন্বিত প্রভাব বিশ্বাসযোগ্যভাবে সাক্ষি কর্তৃক ঘটনা বিবৃত করার সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্থ করে এবং এ বিষয়ে ICTY এবং ICTR এর বিভিন্ন কেস সূত্রে অলোকপাত করা হয় ।

'আকাইসু' মামলার রায়ে বলা হয় যে, সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অনেক সময় 'Cultural Factors' প্রভাবিত করে । এটিও একটি সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা যেটির প্রতি অধ্যাপক কোহেন আলোকপাত করেছেন । Tacaqui কেসের সূত্র ধরে পূর্ব তিমুরে গুরুতর অপরাধের জন্য বিশেষ প্যানেলের সমন্বিত সেমিনার কার্য্যক্রম হতে তিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন । সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানে বিধৃত 'কালেকটিভ মেমোরি'র ধারনাটি ব্যবহার করে আকাইসু ও অন্যান্য মামলায় উদ্ধৃত 'Cultural Factors' এর ধারনাটি ব্যাখ্যা করতে হবে ।

মিঃ মোঃ শাহিনুর ইসলাম (রেজিষ্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল , বাংলাদেশ) উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ ৪০ বছর পরও সাক্ষ্য সংগ্রহ ও সংগঠিত করার চ্যালেঞ্জটি আদৌ অনুত্তীর্ণ নয় । বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনালে যে কোন প্রকৃতির 'প্রবেটিভ এভিডেন্স' গ্রহন যোগ্য যদি তা গ্রহনের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বলে প্রতিভাত না হয় । তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ১৯৭৩ সালের আইনের ১৯ ধারার বিধান অনুসারে সকল রিপোর্ট , ফটোগ্রাফ, ফিল্ম এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি যা সাক্ষ্য হিসেবে মূল্য বহন করে তা গ্রহনযোগ্য । ট্রাইব্যুনালের সকল কার্যক্রম উন্মুক্ত ও স্বচছ । আইনের ১০(৫) ধারার বিধান অনুসারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি শপথ বাক্য পাঠ করবেন না এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ কালে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহনযোগ্য হবেনা [বিধি-৫৬(৩)] ।

জজ অ্যালফনস এম এম অরি (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দি ফরমার যুগোশ্লাভিয়া) আলোচনার শুরুতে প্রশ্ন রাখেন যে, 'পুরোনো সাক্ষ্য'(old evidence) আসলে কি? তিনি বলেন প্রাথমিকভাবে যেকোন সাক্ষ্যই সাক্ষ্য (evidence is evidence) তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক অপরাধের প্রেক্ষাপটে পুরোনো বা সাম্প্রতিক যেটিই হোক না কেন । ফৌজদারী বিচারে সাক্ষ্য হিসেবে যা গৃহীত হয় সেটিই সাক্ষ্য (evidence) এবং অপরাধ সংঘটনের উপাদান সংশ্লিষ্টে যে তথ্য থাকে সেটিও সাক্ষ্য (evidence) । বিভিন্ন আইন সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্য ও এর অনুশীলন হতে 'সাক্ষ্যে'র ধারণাটি বোঝা বা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ন পার্থক্য রয়েছে ।

বিচারক অরি এই পর্যবেক্ষণও দেন যে, সাক্ষ্য 'পুরোনো' (old evidence) হলেই তা দুর্বল বা মন্দ নয় এবং একেবারে 'সাম্প্রতিক সাক্ষ্য' হলেই যে তা খুব ভাল ও জোড়ালো সেটিও নয় ।

যখন উপস্হাপিত সাক্ষ্যের আলোকে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন আইনানুগ দৃষ্টিভংগিকে অতিক্রম করে কার্যক্রমের সাথে জড়িত মনস্তাত্বিক দিকগুলোও অনুধাবন ও লক্ষ্য করতে হবে । অপরাধ সংশ্লিষ্ট ঘটনাটিকে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে, এমনকি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন যখন সহজ বলেও মনে হয় । এইভাবে কোন ঘটনা অনুসন্ধানের লক্ষ্যই হল ঐ ঘটনার সত্যতা যাচাই করা । এই প্রক্রিয়াকে অধিক গুরুত্বপূর্ন বলে ভাবতে হয় যখন কেবল সাক্ষীর বিবৃতি যা বেশ ঝুঁকিপূর্ন সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত তার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে আসা হয় । এই পরীক্ষাগুলো নানাভাবে করা যায় । যেমন, যে অবস্থায় বা পারিপার্শ্বিকতায় সাক্ষি যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে বলে দাবী করে সে বিষয়ে তাকে বিস্তারিত প্রশ্ন করে অথবা সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিকল্প পদ্ধতিতে, যেমন, ডি.এন.এ পরীক্ষা । সাক্ষিকে পরীক্ষা করা সংক্রান্ত প্রাসংগিক বিধি বা নিয়ম অনুসরণ , সন্দিগ্ধ অভিযুক্তকে সনাক্তকরণ এবং কখন সাক্ষির সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহন করা হয়েছে এসবের আলোকে গুরুত্বের মাত্রা বিবেচনায় অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় নির্ভর করে । বিচারক অরি এ প্রসংগে বিচারকদের প্রজ্ঞাময় ভুমিকা, পক্ষগণ কর্তৃক দক্ষ উপস্থাপনা, পেশাগত দক্ষতা ও উপস্থাপিত সাক্ষ্য অনুধাবন ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা করার দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ।

মিঃ এন্ড্রু ক্যালি (ইন্টারন্যাশনাল কো-প্রসিকিউটর, এক্সট্রা অর্ডিনারী চেম্বার্স ইন দ্যা কোর্টস অব ক্যাম্বোডিয়া) বলেন যে, 'পুরোন সাক্ষ্যে'র উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে এক্সট্রা অর্ডিনারী চেম্বার্স এর আভিজ্ঞতা থেকে অনেক বিষয় জানা ও শেখা যেতে পারে । প্রথমত:, অপরাধ সংঘটনের পর যত দ্রুত সম্ভব ও নিয়মিতভাবে সাক্ষ্য সংগঠিত করাটা জরুরী । যেভাবে সংরক্ষিত হলে ঐরুপ সংগঠিত সাক্ষ্য অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করা যায় সেইভাবে তা সংরক্ষণ করা । মূল দলিলাদি সংরক্ষণ এবং এগুলোর ধারাবাহিক সংরক্ষণ ও হেফাজতের বিষয়টিও যেন প্রমান করা যায় সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ ।

কয়েক দশক আগে ঘটে যাওয়া অপরাধ সম্পর্কে ক্যালি বলেন যে,

সেগুলোর ক্ষেত্রে বর্ণিতভাবে সাক্ষ্য সংগ্রহ ও সংগঠিত করা নাও যেতে পারে। তবে, অনুরূপ পুরোন আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যারা প্রাসংগিক সময় থেকেই সাক্ষ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও হেফাজত করেছেন তার বা তাদের সহযোগীতা নেয়া যায়। তদুপরি অপরাধ সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য প্রমান ও দলিলাদি উদঘাটন, সংরক্ষণ, সমন্বয়, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডাটা সিস্টেম এবং অন্যান্য প্রাসংগিক উন্নত প্রযুক্তিও ব্যবহার করা উচিত। এই পদ্ধতি অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত পক্ষ উভয়ের জন্যই একটি মূল্যবান 'টুলস' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, সামাজিক ও আইন বহির্ভূত বিবেচনাগুলোর প্রতি ইংগিত করে প্রসিকিউটর ক্যালি এই মতও ব্যক্ত করেন যে, এগুলো প্রকারান্তরে সাক্ষ্য প্রমানের অস্তিত্ব রক্ষায় ও তা সংগ্রহে তদন্তকারী কর্মকর্তার সুযোগ ও সক্ষমতাকেও প্রভাবিত ও বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

জজ এগনিয়েস্কা ক্লোনোওয়িকা মিলার্ট (জজ, সুপ্রীম কোর্ট, এক্সট্রা অর্ডিনারী চেম্বার্স ইন দ্যা কোর্টস অব ক্যাম্বোডিয়া) কসোভো'র সুপ্রীম কোর্টে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন সূত্রে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার আলোকে আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনের প্রেক্ষিত প্রতিষ্ঠায় যে সমস্যা রয়েছে তার প্রতি তিনি আলোকপাত করে আলোচনা করেন। 'পুরোন সাক্ষ্যে'র এক ধরনের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি সত্বেও দীর্ঘ সময় অতীত হওয়া জনিত কারণেই ঐসব 'পুরোন সাক্ষ্য' ঐতিহাসিক নথি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যা জনমনে সৃষ্ট দ্বন্দ্বপূর্ণ ধারণাকে মসৃন ও হ্রাস করে। তারপরও বিচারক মিলার্ট সতর্ক করেন যে, রিপোর্ট বা বইয়ের মত সেকেন্ডারী উৎসের উপর নির্ভরশীল 'কালেকটিভ মেমোরী'র বিষয়টি অনেক সময় বিপজ্জনক হতে পারে। প্রথমত:, ঘটনাসমুহের প্রেক্ষিত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'ইনডিভিজ্যুয়াল ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি'র বিষয়টি স্পষ্টিকরণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত:, 'facts of public notoriety' হিসেবে যা বিচারকালে উপস্থাপিত হতে পারে সেগুলোর মধ্যে কোনটির প্রতি আলোকপাত করতে হবে সে বিষয়ে সতর্ক ও যত্নশীল থাকতে হবে। এই ধারনাটি ট্রাইব্যুনালের সময় সাশ্রয় করে, যদিও তা সাক্ষ্যের মান নির্ধারণকে প্রভাবিত করতে পারে। অপরাধের প্রেক্ষিত নির্ধারণের সময় সাক্ষ্যের 'সেকেন্ডারী উৎসের' প্রতি চূড়ান্তভাবে নির্ভর করা যৌক্তিক নয়। এটি ঠিক যে, প্রথম কেসে ঐরূপ কোন সাক্ষ্য এলে তা পরবর্তী কেস সমুহেও 'ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল্য বহন করে। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য যেমন, আর্কাইভে রক্ষিত সাক্ষ্য বা গোপনীয় তথ্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সমর্থন ও আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে।

বিচারক মিলার্ট আরেকটি সমস্যা তুলে ধরেন। তা হলো, বিশেষ করে সাক্ষ্যের দৃশ্যমান প্রাপ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে একই সময়ে উপস্থাপিত সাক্ষ্যসমুহের মাঝে ঘাটতি বা দুর্বলতা। অনেক সময় সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে দুর্বলতার বিষয়টি দৃশ্যমান হয় যখন সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহনে তা সংগ্রহ করা হয় এবং সাক্ষ্য সংগ্রহের এই প্রক্রিয়াটি মূলত: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবে বাধাগ্রস্থ হতে পারে। এই কারণে, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে হলেও 'অ্যাডভারসারিয়াল' প্রকৃতির বিচারিক কার্যক্রমকে অনুসরন ও জোড়ালো করা যায়।

ড. প্যাট্রিক জে. ট্রেনর (সি.এম.এস সিনিয়র অ্যাডভাইজর, সাবেক সিনিয়র রিসার্চ অফিসার এবং টিম লিডার, অফিস অব দ্যা প্রসিকিউটর অব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দি ফরমার যুগোশ্লাভিয়া) মন্তব্য করেন যে, আন্তর্জাতিক অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোতে 'পুরোন সাক্ষ্য' অত্যন্ত সফলভাবে ব্যাবহার করা যেতে পারে, এবং তা করা হয়েছেও। অনুরূপ 'পুরোন সাক্ষ্য' কথিত অপরাধ সংঘটন ও এর প্রেক্ষিত প্রমানে সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। প্রাসংগিক দলিলাদি প্রায়শই পাবলিক আর্কাইভে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় তা বিভিন্ন সরকারী সংস্থা বা অফিসের নথিতে, বেসরকারী অফিস বা সংস্থার নথিতে এবং বেসরকারী ব্যক্তির হেফাজতেও পাওয়া যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে অপরাধ সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সাক্ষ্যের প্রাপ্যতা সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে তা পাওয়া যেতে পারে তা তদন্তকালে বিশ্লেষণ করে সনাক্ত করার পর দলিলাদি ও সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। প্রাসংগিক দলিলাদি কোথায় রয়েছে তা চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করতে হবে এবং তারপর এগুলোর অনুলিপি প্রস্তুত করা বা মূল দলিল জব্দ করা, যেটি যথার্থ বলে বিবেচত হয়। এরপর তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংগৃহিত দলিলাদি সহ অন্যান্য সাক্ষ্য ও তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শুরুর কাজ করা এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণের স্বার্থে কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন প্রয়োজন হলে ঘাটতি বা বিভ্রান্তি ও তদন্তের অন্যান্য দিক চিহ্নিত করে পরবর্তী দলিল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ তদন্তের যেকোন পর্যায়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে এটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সংঘটিত অপরাধের সমর্থনে কতটুকু বিষয় উদঘাটিত হয়েছে এবং আর কি কি বিষয় উদঘাটন করা উচিৎ।

যখন সাক্ষ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং সামগ্রিকভাবে তদন্ত কাজ সম্পন্ন হয় তখন চূড়ান্ত বিশ্লেষণে 'ইনডিভিজ্যুয়াল ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি'র বিষয়টি বেরিয়ে নাও আসতে পারে। তাই বিচারকালে সাক্ষ্য হিসেবে সংগৃহিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দলিলাদি উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রাসংগিক বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা সমৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিশ্লেষণ-পত্র একটি কার্যকর ও দক্ষ প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সাক্ষ্য সংগ্রহ এবং সাক্ষ্য ও দলিলাদি বিশ্লেষণের কাজটি মূলত: বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যোগ্য স্টাফ সদস্যরাই সম্পন্ন করে থাকেন এবং তারাই আদালতে উপস্থাপনের জন্য যথাযথ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারেন -- ড. ট্রেনর মন্তব্য করেন।

ড. সীনা ফাজেল (ক্লিনিক্যাল সিনিয়র লেকচারার ইন ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং সি.এম.এন অ্যাডভাইজর) 'ট্রমা' জনিত কারণে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্থ মানবস্মৃতি সংশ্লিষ্ট 'বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যে'র প্রতি আলোকপাত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এক প্রাথমিক জরীপে দেখা যায় যে, কোন ঘটনা বিবৃত করার ক্ষেত্রে একজন স্বাভাবিক মানুষেরও স্মৃতিশক্তি বা স্মৃতি সক্ষমতা বিলম্বের কারণে প্রভাবিত হয়। বিলম্ব জনিত কারণে স্মৃতি প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়-- বয়স্ক বা বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং কোন 'ট্রমা' আক্রান্ত ব্যক্তি। ড. ফাজেল বলেন যে, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য অনুসারে স্বাভাবিক ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি এবং 'ট্রমাটাইজড' ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির মাঝে ভিন্নতা পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'ট্রমাটাইজড' ব্যক্তির ক্ষেত্রে মূল ঘটনার সাথে প্রাসংগিক অথচ অগুরুত্বপূর্ণ ও জড়িত অনেক ছোট ছোট বিষয়ে তার স্মৃতি বিভক্ত হয়ে

পড়ে। এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট একমত নেই যে, স্মৃতিশক্তিকে চাপ দিয়ে উন্নত বা দমিত করা যায় কিনা। যদিও কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, তারপরও মূল আবেগ সংশ্লিষ্ট ঘটনার স্মৃতি অক্ষুন্ন থাকে। গবেষণার ফলাফলে এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, 'ট্রমা' এবং 'স্মৃতিশক্তি'র মাঝে একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং 'ট্রমা' এমন একটি বিষয় যা মনস্তাত্বিক ও জৈবিক বিষয় নির্ভর এবং তা একেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে।

মি: শ্রিয়ানা (হেড অব ডিভিশন অব মনিটরিং এন্ড ইনেভেস্টিগেশন, ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনাল কমিশন অন হিউম্যান রাইটস) ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় সংঘটিত 'ম্যাসাকার' বিষয়ে কমিশন যে তদন্ত করেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। জুন ১৯৯৮ হতে ঐ ঘটনার তদন্ত শুরু হয় এবং এফ.আই.সি.এইচ.এল এর এই সেমিনার চলাকালীন সময় পর্যন্ত তা চলছে। তিনি বলেন যে, কমিশন এ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি, জাভা এবং কালিমানতান এলাকা হতে ৩৬০ জনের সাক্ষ্য বা বিবৃতি গ্রহন করেছে । এই তদন্তের ভিত্তিতে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' সংঘটনের যথেষ্ট সাক্ষ্য উদঘাটিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন । কিন্তু তারপরও একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষেই এটর্নী জেনারেল বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করা হবে । একটি 'অ্যাডহক হিউম্যান রাইটস কোর্ট' প্রতিষ্ঠার জন্য 'হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ' কর্তৃক সুপারিশেরও প্রয়োজন ছিল।

মি: শ্রিয়ানা তাদের কমিশন ঐসব অভিযোগ তদন্তে যেসব বাস্তব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, ইন্দোনেশিয়ার কিছু প্রত্যন্ত এলাকা সহ দেশের বাইরে যেখানে কোন ভিকটিম ও সাক্ষি আশ্রয় নিয়েছে সেখান থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াটিকে কমিশনের সীমিত আর্থিক ও মানব সম্পদ অনেকটা জটিল করেছে। সাক্ষ্য হিসেবে গণকবরের ব্যাবহারও কঠিন, কারণ এজন্য ইন্দোনেশিয়া কর্তৃপক্ষ হতে অনুমতি সহ পর্যাপ্ত ফরেনসিক সহায়তা প্রয়োজন।

সেমিনার চলাকালে এটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের বিষয়টির সাথে মানব ও সামাজিক মূল্যবোধ সহ পর্যাপ্ত ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে , ঐসব অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র যখন অগ্রসর হয় তখন সর্বোচ্চটুকুই করা উচিৎ। রাষ্ট্রকে এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, এই প্রক্রিয়ায় গৃহিত প্রতিটি পদক্ষেপে যেন সর্বোচ্চ ফল পাওয়া যায়। তাদের পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব যেন প্রক্রিয়াটিকে কোনভাবে বিনষ্ট না করে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের বিষয়টি নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের জন্য এটি পেশাদারিত্বের একটি প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ। এটি একটি দায়িত্ব ও স্বাভাবিক মান অর্জনের বিষয়ও বটে। এসব গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের মাধ্যমে আপোষকামীতাকে দমনে তদন্তকারী কর্মকর্তা, প্রসিকিউটরস, বিচারকদেরই এই চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করতে হবে, সেই অপরাধ সমুহ অনেক দীর্ঘ সময় আগে বা সাম্প্রতিক সময়ে যখনই তা সংঘটিত হয়ে থাকুক না কেন। এই ধারণার আলোকে তদন্তকাজ , প্রসিকিউশন, ডিফেন্স এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন সূত্রে যারা জড়িত তাদের জন্য 'পুরোন সাক্ষ্য' একটি প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ বটে।

উপস্থাপনার এক পর্যায়ে এই পর্যবেক্ষণ দেয়া হয় যে, নিজ ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার রয়েছে, যদিও ইতিহাসের প্রতিটি বিষয় বিস্তারিতভাবে দলিলায়িত হয়না। তবে সাজা বা দন্ড প্রদানের বিষয়টি যেক্ষেত্রে কঠোর সেখানে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারে তুলনামূলকভাবে উচ্চ মান সম্পন্ন সাক্ষ্যের প্রযোজ্যতা থাকা উচিৎ। যদিও 'পুরোন সাক্ষ্য' এসব অপরাধের বিচার না করার ক্ষেত্রে কোন অজুহাত হওয়া উচিৎ নয়, এক্ষেত্রে কেবল বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। ভিকটিমের স্বার্থের বিষয়টি সব সময় মাথায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ -- কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্থ করার জন্য নয়, বরং কি ঘটনা ঘটেছিল এবং সেসব ঘটনার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি দায়ী কিনা তা আদালত কর্তৃক যাচাই করার জন্যও বটে।

বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমুহের প্রেক্ষিতে এটি বলা যায় যে, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিচারে যে ধরনের পেশাদারিত্ব প্রয়োজন ঠিক একই মাপের পেশাদারিত্ব 'পুরোন আন্তর্জাতিক অপরাধের' বিচারের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সাক্ষ্যের বয়স কত তা কোনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নিয়ামক নয়। Deterrence and Reconciliation উভয় ক্ষেত্রেই বৈধ স্বার্থ রক্ষায় 'পুরোন সাক্ষ্যে'র ভূমিকা রয়েছে এবং বিশেষ করে Reconciliation এর ক্ষেত্রে অনুরুপ স্বার্থ রক্ষায় 'পুরোন সাক্ষ্য' নিয়ে পেশাদারিত্ব ও সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয়।

মর্টেন বার্গসমো জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ; সিনিয়র রিসার্চার, ইউনিভার্সিটি অব ওসলো, নরওয়ে; ভিজিটিং ফেলো, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি; এবং আই.সি.সি কনসালট্যান্ট (কো-অর্ডিনেটর অব দ্যা আই.সি.সি লিগ্যাল টুলস প্রজেক্ট)। তিনি এফ.আই.সি.এইচ.এল প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটি ও 'কেস ম্যাট্রিক্স নেটওয়ার্ক' (www.casematrixnetwork.org) পরিচালনা করছেন । এই 'পলিসি ব্রিফ ' এর কাজটি ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে শেষ হয়। এটি http://www.fichl.org/policy-brief-series/. ISBN 978-82-93081-53-1 পাওয়া যাবে।

TOAEP | Torkel Opsahl Academic EPublisher

Torkel Opsahl Academic EPublisher
E-mail: info@fichl.org
www.fichl.org/toaep